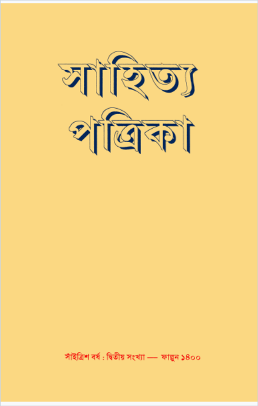

Vol. 37 | No. 2 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শহীদ কাদরীর উত্তরাধিকার

Volume	37
Issue	2
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিদ্দিকা মাহমুদা
Published online	February 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i2.3
Pages	71-90
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

শহীদ কাদরীর *উত্তরাধিকার*

সিদ্দিকা মাহমুদা

ষাটের প্রজন্মের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিব্যক্তিত্ব শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উত্তরাধিকার* (১৯৬৭)। শহীদ কাদরীর কবিতায় রয়েছে অগ্রসরতা। সুগভীর জীবনবোধ, বিশ্বনাগরিক চৈতন্য এবং আধুনিক শিল্পদৃষ্টি সমন্বয়ে তিনি গ্রন্থিত করেছেন পরিণতির মননমুদ্রা।

উত্তরাধিকার-এর অধিকাংশ কবিতা উত্তম পুরুষে স্বীকারোক্তিমূলক ভঙ্গীতে রচিত। স্বাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞের বোধ, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির উত্তরাধিকার কবিকে কেবলই নেতিবাচকতায় আক্রান্ত করেছে। যুগপৎ ভাবে ও ভাবনায় তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সন্নিকট, তাঁর কবিতার নানা প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয় বোদলেয়ারকে আবার আধুনিক সভ্যতার শূন্যতার চিত্রাঙ্কনে এলিয়টের সমীপবর্তী হয়েও তিনি পৃথক।

শহীদ কাদরী নাগরিক চৈতন্যে লালিত কবি। কিন্তু তার নগরচৈতন্য শামসুর রাহমানের ন্যায় ইতিহাস-ঐতিহ্য-কিংবদন্তী স্নাত নয়। নাগরিক পরিভাষা তাঁর কবিতায় ঔজ্জ্বল্য সঞ্চার করেছে। পাশাপাশি, পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নৈসর্গিক উপকরণ। শহীদ কাদরী বাংলাদেশের কবিতায় এক নতুন উত্তরাধিকার নির্মাণ করেছেন।

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবহমান বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে সংলগ্ন থেকে পঞ্চাশের দশকে শহীদ কাদরী [জ. ১৯৪২] কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, পাকিস্তান ও মুসলিম ঐতিহ্য-অভিষেক, নতুন সামন্ত রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর কবিতায় ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। বরং সমকালের চূর্ণ স্বপ্নের অনুভবপুঞ্জ কবিচৈতন্যে সঞ্চার করেছিল এক উন্মূল মানসিকতা। ফলত অস্থিরতা, যন্ত্রণা, অন্বেষণ ও দাহ তাঁর কবিতার প্রাথমিক লক্ষণ ; যদিও বহুপাঠী মানসের মননশীলতা, বোধ ও বোধি সেখানে অঙ্গাঙ্গী।

পঞ্চাশের দশকে কবিতাচর্চা শুরু হলেও শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উত্তরাধিকার* প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে কবির মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, দেশে যখন সামরিক প্রশাসক মোহাম্মদ আইয়ুব খানের দুঃশাসন জনমনে নানা প্রশ্নের সঙ্গে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। শহীদ কাদরী এই কালো দশকের অন্ধকার-তাড়িত তরুণ কবি। একদিকে নগরজীবনের ক্লেদ, গ্লানি, শূন্যতা, অবক্ষয় এবং অন্যদিকে কেবলই প্রতিবন্ধকতার মুখে সবকিছুর সঙ্গে অনাত্মীয়তাবোধ কাব্যজীবনের শুরুতেই তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল এক নিঃসঙ্গ প্রান্তরে যেখানে বোদলেয়রীয় বিবমিষা, এলিয়টের ক্ষয়িষ্ণুতা, সুধীন্দ্রনাথের নেতিবাদ, বীটনিক বিদ্রোহ বাংলাদেশের ষাট দশকের *স্যাড জেনারেশনের* বিপন্ন মনোভাবের সঙ্গে মিশে অনিবার্য করে তুলেছিল এক সর্বাত্মক নঞর্থকতার ফলন। চল্লিশের মার্কসবাদী কবিদের প্রত্যাশা বা প্রত্যয় সেখানে কোন শিকড় প্রসারিত করতে পারে নি। তবে এই বিপন্নতা ও অসহায়তার খাঁজে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকেত সার্বক্ষণিক এবং প্রবল না হলেও কখনও কখনও তা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের মত অনুভবগম্য। সময়ের পট পরিবর্তনের ফলে তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতার ঘটেছে রূপান্তর এবং গভীরতর জীবনানুভব যেমন গ্রথিত হয়েছে তেমনি প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনার ধারাটিও থেকেছে বহমান।

শহীদ কাদরী ষাটের প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বশীল কবিব্যক্তিত্ব হিসেবে নন্দিত হয়েছেন। বাংলাদেশের কবিতার ধারা লক্ষ করলে দেখা যায় চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের পর ষাট দশকে উত্থান ঘটেছিল একদল নবীন কবির, চিন্তা-চেতনায় অবক্ষয়-আক্রান্ত হলেও যাঁদের প্রকাশভঙ্গিতে ছিল স্বতঃস্ফূর্তি। পশ্চিমবঙ্গের *হাংরি* ও 'শ্রুতি' গোষ্ঠীর মত এই নিরীক্ষাপ্রবণ কবিসম্প্রদায় প্রথাগত কাব্যভাবনা ও আঙ্গিকের বলয় থেকে বেরিয়ে আসার নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। *স্বাক্ষর, সাম্প্রতিক , বক্তব্য, প্রতিধ্বনি, স্যাড জেনারেশন, না, কণ্ঠস্বর, কালবেলা* ইত্যাদি বিচিত্র *লিটল ম্যাগাজিনকে* কেন্দ্র করে এঁরা গড়ে তুলেছিলেন কবিতার এক নিজস্ব ভুবন। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত *স্যাড জেনারেশন*-এর বুলেটিনে বলা হয় :

We don't know what we are doing. We are really undone, really helpless. We are poisoning us consciously. Yet we are helpless and helpless. We are guilty. We are bearing dynamites in our blood. We know it. But we are helpless, simply undone. we have no other alternative except SELF-DESTRUCTION.

ষাট দশকের সাহিত্য পত্রিকা *কণ্ঠস্বর* (১৯৬৫)-এর ঘোষণা ছিল :

যারা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট *কণ্ঠস্বর* তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত।

ষাটের বিমর্ষ প্রজন্মের কবিকুলের অসহায়তা, অপরাধবোধ ও আত্মহননেচ্ছার মূলে ছিল প্রচলিত মূল্যবোধে অনাস্থা, যাপিত জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং বিরূপ দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে রাজনীতির প্রতি অনাগ্রহ। অনিবার্যভাবে এঁদের কবিতায় ছিল অবক্ষয়, নৈঃসঙ্গ্য, শূন্যতা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি, রিরংসার উচ্চারণ। এঁদের অনেকেই অশ্লীল, রুচিবিগর্হিত, বিকৃত, অপাঠ্য হিসেবে নিন্দিত হয়েছেন ; কিন্তু বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে পালাবদল যে এঁদের হাতেই ঘটেছিল, এ সত্য অবশ্যস্বীকার্য। তবে ষাট দশকের শেষের উত্তাল গণআন্দোলন কবি চেতনায় একটি ইতিবাচক প্রান্ত যোগ করে ; দেশ-কাল-রাজনীতি সম্পৃক্ত সচেতনতা এবং দ্রোহাত্মক ভাবনা ক্রমাগত প্রগাঢ় করে তোলে স্বদেশপ্রেম।

শহীদ কাদরী অত্যন্ত স্বল্পপ্রসূ কবি। ষাট ও সত্তর এই দুই দশকে তাঁর মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। *উত্তরাধিকার*- এর পর *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* (১৯৭৪) এবং *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই* (১৯৭৮)। তবে তাঁর কবিতায় রয়েছে অগ্রসরতা; সুগভীর জীবনবোধ, বিশ্বনাগরিক চৈতন্য এবং আধুনিক শিল্পদৃষ্টির সমন্বয়ে তিনি গ্রন্থিত করেছেন পরিণতির মননমুদ্রা।

উত্তরাধিকার গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা উত্তম পুরুষে স্বীকারোক্তিমূলক ভঙ্গিতে রচিত। এক নিরাশ্বাস সময়ের কবির আত্মজৈবনিক ভাষ্য এই পংক্তিমালা:

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে-
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগ্‌রে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্প্‌পোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু, রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউটে আঁধারে।

[উত্তরাধিকার]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিমিরগ্রস্ত পৃথিবীতে এক নিরালোক সন্ত্রস্ত শহরে জন্মে কবি দেখেছেন আনন্দোচ্ছল পার্ক থাকে কাঁটাতারে ঘেরা। তাঁবু, সারিবদ্ধ সৈনিকের কুচকাওয়াজ, জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান চারদিকের গাছপালা-ঘরবাড়িকে রণাঙ্গনে বদলে দেয় ; ঝরে যায় প্রেম, ফেনিল উৎসবে ঢেকে যায় আততায়ীর মুখ, নির্যাতিতা মহিলা, দগ্ধ গ্রাম ; বালকের মুঠো থেকে খসে পড়ে বেলুনের সূক্ষ্ম সুতো এবং এক অচেনা দুর্বোধ্য ত্রাস এসে জমে কবির চোখের নীচে। নির্বোধ অলসের হাসিতে তিনি মূল্যবোধের গোধূলিভাষ্য রচনা করেন :

—এইমতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
এবং আমাকে নিষ্কপর্দক , নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
ক'রে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা!

[ঐ]

স্বাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞের বোধ, অভিজ্ঞতা, স্মৃতির উত্তরাধিকার কবিকে কেবলই নেতিবাচকতায় আক্রান্ত করে এবং অন্ধকার ও নৈঃসঙ্গ্যকে সঙ্গী করে তিনি মধ্যরাতে উন্নিদ্র থাকেন একটি রক্তাক্ত জবার মত বিপদসংকেত জ্বেলে ; অভিন্ন হয়ে যান তিনি একটি কম্পমান কম্পাসের সঙ্গে যা নির্ভুলভাবে দিকনির্দেশ করে যায়। জীবনের সঙ্গে কানামাছি খেলতে খেলতে জন্মেই কুঁকড়ে যাওয়া নঞর্থক কবিচৈতন্য যেন এমনি কোন দিকনির্দেশের প্রতীক্ষা করে।

জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত আমি,
বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ, কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান!

[নপুংসক সন্তের উক্তি]

যুগপৎ ভাব ও ভাবনায় তিনি যাঁর সন্নিকট সেই সুধীন্দ্রনাথের ন্যায় অগ্রজের পাপের দায়ভার বহন করে যাওয়ার উপলব্ধি বারংবার পীড়িত করেছে শহীদ কাদরীর চেতনালোক :

আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা ? সবার আত্মার পাপ
আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার মতো লেগে আছে ?

[ঐ]

তরুণ ঘোড়ার পিঠে পেরিয়ে আসা শৈশবের সামনে আজ বিস্বাদ, পীতাভ, দৃষ্টিহীন আকাশ মরচে পড়া জানালার শিকে আটকে আছে। 'যেন আমার মৃত অশ্বের ছাল টানিয়েছে কেউ/ অকরুণ রোদ্দুরে!' (জানালা থেকে)। সন্ধিৎসু সন্তের মত অবিশ্রাম হেঁটেছেন তিনি সুন্দর সূর্যাস্ত থেকে ভোরবেলাকার সূর্যোদয় পর্যন্ত; কিন্তু শূন্যতার বস্ত্রমোড়া আততায়ী শয়তানের প্রতারক মুখ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নি। বোদলেয়ারের মত তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে সন্ত ও শয়তানের প্রসঙ্গ। এই সন্ত কবি নিজেই- অন্বেষক, পরিব্রাজক, ভ্রাম্যমান এবং সত্যসন্ধ। অপরদিকে শয়তানকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে ছুঁয়ে যেতে সমাজ-সংসার-রাজনীতি :

জরা, মৃত্যু আর্তির চন্দন-ফোঁটা তাঁর অবয়বে,
প্রশান্ত করেছে তাকে সন্ধ্যার মতোই আগাগোড়া,
আততায়ী, -লুকিয়ে রয়েছে প্রেমিকার অনুনয়ে,
অনুজের মূল্যবোধে, আমাদের উদ্বাস্তু দশকে
প্রগতির অন্বেষায় আর প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ
পিছুটানে, যত্রতত্র সমৃদ্ধির সকল খবরে,
সংবাদপত্রে মানুষের অন্তিম গন্তব্যে, আর
ক্রুদ্ধ সম্পাদকীয় মন্তব্যে!

[নিরুদ্দেশ যাত্রা]

রবীন্দ্রকবিতার শিরোনাম শিরোধার্য করেও শহীদ কাদরী অতিক্রম করতে পারেন না 'ক্লেদজ কুসুম'-এর বৃত্ত। পাপ ও পতনের অন্ধকারময় চিত্র, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ মানুষ ও প্রতিবেশ, বিতৃষ্ণা, ক্লান্তি , মৃত্যু তাঁর কবিতায় দৃঢ় ও গাঢ় প্রভাব

বিস্তার করে। সেখানে গোলাপ বাগানে দৃশ্যমান হয় রাঙা বৌয়ের পচনশীল দেহ; চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ট্রেনে কাটা শূকরের লাল রক্ত, মৃত্যু, আর্তনাদ, বিভীষিকা; নীলিমার রঙিন উদ্যান ঢেকে যায় আঁস্তাকুড়ে, ছেঁড়া-খোড়া ত্যক্ত, বেসামাল বীজানুর উৎসবে, কৃমিময় দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমায়। অন্ত্রনালীতে ঘা এবং নির্ঘুম রাত্রিতে নির্বীজ কান্নার মত এক ফোঁটা চাঁদ শহীদ কাদরীর সহচর, যার অনুধ্যানে আজ আর মাধুর্য ক্ষরিত হয় না, বরং মনে হয় 'নিঃশেষিত সকল গেলাস' (সমকালীন জীবনদেবতার প্রতি)। কবি প্রস্থান করেন কবিতার শুঁড়িলোকে, কিন্তু ঝিল্লীমুখর পৌষরজনীতে লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতার 'দন্তে ধার, ময়লা নখ, তামাটে দীর্ঘচুলে জটা' (ঐ)। শূন্যতার অদ্ভুত আদল ঝুলে থাকে মধ্যরাতে রেস্তোরাঁর কড়িকাঠে। কবির প্রশ্ন :

বাদুড় না বেলুন বন্ধু, স্বপ্ন না হতাশার ঠাসা ?
[ঐ]

অতঃপর অলৌকিক সব দ্রব্যাদি খেয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকা মাত্র। সুহৃদের তিরস্কার, অগ্রজের ভৎসনা ব্যর্থ হয়। টেবিলে উল্টে থাকে 'সাধের গেলাস আর নীল বাক্সো ম্যাচিসের ময়ূরের বর্ণালী পালক' (নিরুদ্দেশ যাত্রা)। জানালায় যমদূতের ন্যায় ত্রাস নেচে ফেরে, সংকেতিত করে গহ্বর, কবর আর ম্লান, পাণ্ডুর নিঃস্বপ্ন রাত। কবি অনুভব করেন 'তাই অগ্রজের আয়োজন শুরু হয় বধ্যভূমির চৌদিকে/ আমাকে বলির পশু জেনে নিয়ে' (নপুংসক সন্তের উক্তি)। এখানেই শেষ নয়। উদঘাটিত হয় মৃত্যু-পরবর্তী ভয়ানক দৃশ্য :

আমার কবরে আমি জ্বলন্ত শেয়াল
সন্তর্পণে নাকে শুঁকে রাত্রির নিঃশব্দ মখমলে
আমার টাটকা শব ফেরে যেন আমারই দখলে
বিঘ্নহীন, রক্তমাংস হাড়গোড় চেটেপুটে সবই খাওয়া হয়
[মৃত্যুর পরে]

এভাবেই এক সার্বিক শূন্যতার উচ্চারণ লেপটে থাকে *উত্তরাধিকার* কাব্যগ্রন্থের সর্বাঙ্গে।

শহীদ কাদরী নাগরিক চৈতন্য-লালিত কবি। তাঁর নাগরিক বোধের একপ্রান্তে যেমন দীপ্র আধুনিকতা, অন্যপ্রান্তে তেমনি ক্লান্তি, ক্ষয়িষ্ণুতা, নৈঃসঙ্গ এবং

অসহায়তার বোদলেয়ার-এলিয়ট বাহিত অনুভবপুঞ্জ। 'সঙ্গতি' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন সেই সব হলুদ একসার বিকৃত মুখকে যারা পাশাপাশি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েও পারস্পরিক দূরত্ব জয় করতে পারে না, নামহীন অহংকার তাদের ঘিরে রাখে যদিও জীবনের রং নেই সেখানে। এই পরস্পরের থেকে ফেরানো মুখগুলো হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এক ধরনের নিতান্ত নিজস্ব কাঁচ বয়ে বেড়ায়; অথচ যখন সন্ধ্যার নির্বোধ হাওয়া গন্ধ ছাড়ায় এবং 'স্কার্ট-ঢাকা সোনালি চুলের ইন্দ্রজালে দীর্ঘ, ঋজু ক্ষীণ উরুর বিদেশিনী'র সমাগম ঘটে তখন সম্মিলিত কণ্ঠে ভিখিরির মত গুঞ্জন ওঠে। মেকী চাকচিক্যের অন্তরালে পরম অন্তঃসারশূন্যতার এই ছবি তৃতীয় বিশ্বের অপর এক নাগরিক কবি সমর সেনের স্মৃতি জাগ্রত করে। 'নংপুসক সন্তের উক্তি' কবিতায়ও উন্মীলিত হয় একই ভীড়াক্রান্ত, বর্বর, বিব্রত, ঊর্ধ্বশ্বাস শহরের দৃশ্যপট যেখানে রুগ্নউরু প্রেমিকার চোখে স্বপ্ন দোলে না, প্রেমিকের চোখও অস্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন-যে চোখ সে কখনও প্রেমিকার চোখের উপর ন্যস্ত করতে পারে না, কম্পমান অবিবেকী হাতে প্রেমিকার পীতাভকুন্তলে ম্লান ফুল গুঁজে দেওয়ার ঐতিহ্যসম্মত ভূমিকা পালন করে মাত্র। জীবনের এই নির্বোধ আনন্দ-গান এবং অনাত্ম উৎসব কবিকে স্বস্তি দেয় না। আতর লোবানের গন্ধমাখা ধর্মীয় শান্ত শুদ্ধ পরিবেশে তিনি শান্তি পান না। প্রশ্নক্ষত হন বারংবার :

> সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় কেন তবে কষ্টশ্বাস ?
> কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,
> জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
> আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন
>
> সদ্য উঠে-আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ!

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ, এই অন্ধকারময় যন্ত্রণাক্ত অস্তিত্বের অনুভব জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথের ন্যায় শহীদ কাদরীকেও পীড়িত করেছে। জ্যোৎস্নালোকিত রোমান্টিক প্রহর তাঁকে উতলা করে নি। বাগানের ফুলগুলো মনে হয়েছে জ্যোৎস্নায় বিব্রত, তিনি বকুলতলায় বিছিয়ে রেখেছেন হতাশা, মনে হয়েছে অবিশ্বাস কালো মখমলের টুপি পরে বাগানে পরিভ্রমণ করে বেড়াবে। এভাবে শুধু *এ্যান্টি* রোমান্টিকতা নয়, কখনও কখনও *মরবিডিটি* গ্রাস করেছে তাঁকে।

'আমি কিছুই কিনবো না' শীর্ষক কবিতায় এলিয়টের ফাঁকা ও ফাঁপা শহরচিত্র। দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার নিয়ে কবি ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে ঘুরে বেড়ান।

সুগভীর বেদনা যেন তিনি উড়িয়ে দিতে চান হালকা চালে, ঢিলেঢালা হাওয়ায় ফোলানো ট্রাউজারে, বিপর্যস্ত চুলে। বিজ্ঞাপনের আলো, সিনেমার কিউ, মদিরার চেয়ে মধুর সব টেরিলিনের সার্ট দেখতে দেখতে একা ঝলসানো মুখাবয়ব নিয়ে খোলা রেস্তোরাঁগুলো অবহেলায় পেরিয়ে যান। কিছুই কিনবেন না তিনি। দুদিকে তাঁর ক্লান্ত জীবনযাপনের মিছিল- আঙুলে কালির দাগ আর মুখে ভয়ের চিহ্ন নিয়ে সারি সারি কেরানির দল চলে। কবিকণ্ঠ কৌতুকে মুখর হয় :

টাইপরাইটারে ছাওয়া সারা দেশ, কি মুখর, উন্মুখর
কত না রঙ্গ জানে শো-কেসের সাজানো শেমিজ, শাড়ি
ঝলমলে ছোট বড় ঘড়ি
তিনজন অন্ধবুড়ো জ্যোৎস্নাভরা মাঠে কী কৌতুকে
গালমন্দ পাড়ে
গান ধরে অন্ধকার গলি, 'হে প্রেম, হে আমার প্রেম!'

কিন্তু পার্কের রেলিঙে উপবিষ্ট বধির পাগলের অট্টহাস্যে ধ্বংসের খরতাল নিনাদিত হয় এবং কবি শহীদ কাদরী তাঁর পকেটভর্তি স্বপ্ন নিয়ে একটি সন্ত্রস্ত ক্রন্দসী অস্তিত্বে রূপান্তরিত হন :

জয়ধ্বনি থেকে ক্রন্দনে আমি
উদ্ধত পতাকা নীচে একা জড়োসড়ো -
- আমি কিছুই কিনবো না!

আধুনিক সভ্যতার শূন্যতা চিত্রাঙ্কনে এলিয়টের সমীপবর্তী থেকেও পৃথক হয়ে যান শহীদ। একটি সামরিক শাসনকবলিত দেশের শৃঙ্খলিত কবিআত্মার অনুভব অনুক্ষণ তাঁকে ঘিরে রাখে। সব উদ্বেগ ও ব্যর্থতা সমাহিত হতে চায় ফ্রয়েডীয় নীল অবচেতনায়, অনিবার্য হয় পরাভববোধ :

ক. কেন না যদিও ধূর্ত আমি শেয়ালের মতো
গৃহস্থের করুণায় কোনমতে বাঁচি
আর অচিকিৎস্য উজবুকের মতো
হতাশার প্রসারিত উঠোন পেরিয়ে

অতল সংকীর্ণ কোন নীল স্বপ্নকূপে ডুবে মরি,
অতএব অনায়াসে ধরাশায়ী হতে পারি আমি!

[আমন্ত্রণঃ বন্ধুদের প্রতি]

খ. পরাস্ত সকল ইচ্ছা, উদয়াস্ত যা-যা ভেবে মরি
তার কোন সুন্দর সচল সমাধান করে দিতে পারবে না এই হাওয়া
শুধু এক নির্বোধ, পরম বালখিল্যতায় জড়িয়ে ধরতে চায় গলা।

[চন্দ্রালোকে]

অতএব উঠে আসে পরাবাস্তব চিত্রকল্প :

ক. দেয়ালে ছায়ার নাচ
সোনালি মাছের।

[স্মৃতিঃ কৈশোরিক]

খ. দূর দর-দালানের পারে
আবছা মাঠের পরে নিঃশব্দে ছিন্ন ক'রে জোনাকির জাল
ছুটে গেল যেন এক ত্রস্ত ভীত ঘোড়ার কঙ্কাল!

[জানালা থেকে]

গ. হঠাৎ ক্ষতগুলো
মাতালের প্রোজ্জ্বল চোখের মত,
মগ্ন, উৎসুক মুখ
আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

[পরস্পরের দিকে]

যথার্থই এই বিপণন সভ্যতা কোনো সমাধান নির্দেশ করতে পারে না। কাফের গুমোটে বেকার হাঘরে যুবকদের জটলা চলে, দূর ম্যানসনে গাড়ীবারান্দায় মেঘার্দ্র আকাশের নীচে জনতা গল্পগুজবে মুখর হয়। কবির চোখে পড়ে শহরে বিজ্ঞাপনের ভাঁজে, খেলনার মত বাড়িঘরে, আলিঙ্গনরত নরনারীতে ঈর্ষা ও আকাঙ্ক্ষার পরম রমণীয় চিত্র। উৎসবের নাগরদোলায় অন্তহীন মানুষের ওঠানামা চোখে পড়ে তাঁর- 'যদিও পরনে সবার/ শাদা-শাদা নিষ্করুণ বিষন্ন, ঠাণ্ডা, মরা জামা' (ভরা বর্ষায়:

একজন লোক)। কেননা অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, অভিশঙ্কা জড়িয়ে আছে এদের ভেতরমূলে।

'মোহন ক্ষুধা', 'চন্দ্রালোকে', 'ইন্দ্রজাল' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় উন্মোচিত নৈশ শহর :

উনুনের লাল আঁচে গাঁথা-শিকে জ্বলছে কাবাব,
শীতরাতে কী বিপজ্জনক ডাক দ্যায় আহ্লাদে শহর,
কালো রাস্তার বেঞ্চিতে চলো যাই পঙ্‌ক্তিভোজনে, ক্ষান্ত তবে
হবে কি প্রেতার্ত ক্ষুধা ?

[মোহন ক্ষুধা]

এই ক্ষুধা অন্য এক ক্ষুধার জানান দেয়। চন্দ্রালোকে বদলে যায় দিনের মানুষগুলো, তখন ধাতুময় শহরের কোন সংগোপন ফাটল থেকে হাওয়া ওঠে : পার্কে, ঝোপে-ঝাড়ে, ঘরে অথবা মোটরের অপরিসর ফিকে আঁধারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বলে :

তখন ইন্দ্রিয়ের সবুজ ঝোপে
পাঁচটি লাল ফুল আনে সৌরভের রাত

[ইন্দ্রজাল]

বোদলেয়ারের পর থেকে আধুনিক কবিরা কবিতায় ব্যবহার করেছেন গণিকা-পট। শহীদ কাদরীর একাধিক কবিতায় গণিকা-প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। 'আলোকিত গণিকাবৃন্দ' শীর্ষক কবিতাটি সম্পূর্ণত এই 'রুগ্ন গোলাপদলের' উদ্দেশে নিবেদিত। যখন সব রাস্তা, রেস্তোরাঁ, সুহৃদের দ্বার বন্ধ হয়ে যায় তখন দিগন্ত রঞ্জিত করে ওড়ে এদের কেতন-'অদ্ভুত আহ্বান যেন অস্থির অলৌকিক আজান।' বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, নষ্টভাগ্য, পিতৃমাতৃহীন, অসুস্থদের কাছে এই গণিকাদল পরম শুশ্রূষাস্বরূপ। অচির মুহূর্তের ঘরের এইসব উজ্জ্বল ঘরণী ভ্রাম্যমানকে ফিরিয়ে দেয় ঘরের আঘ্রাণ। কবিকণ্ঠে স্তুতি ধ্বনিত হয়:

তোমাদের স্তব বৈ সকল মূল্যবোধ যেন ম্লান!

যেমন নিভৃত গৃহকোণের পরিবর্তে উদ্বাস্তু দশকের এই মানুষগুলোর আশ্রয় রচনা করে নগরীর গজিয়ে ওঠা কাফে-রেস্তোরাঁ, তেমনি চিরন্তনীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয় নগরসভ্যতা-উপজাত এই সামান্য শ্রেণী। এবং সবকিছুর ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শূন্যকেন্দ্র নগর-মানুষের অস্থির অনিশ্চিত ভাসমানতা।

দেশকালের প্রচ্ছদ থেকে মুখ ফিরিয়ে এসময় কোনো কোনো কবি নগ্নতার বিবরবাসী হয়েছিলেন। 'নগ্ন' কবিতায় শহীদ কাদরীর অনুরূপ উচ্চারণ লক্ষণীয়। তবে এই নগ্নতাকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন সন্তের নিঃসঙ্গতায় ও নিষ্কাম ভাঁড়ের বিস্ময়ে, হতাশা ও মৃত্যুর বিপরীতে স্থির কোনো কেন্দ্র হিসেবে। দেহবাদের অনুধ্যান অবশ্য আধুনিক কবিতার একটি পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ এবং শহীদ কাদরীর কবিতায় তার পরিচয় উৎকীর্ণ:

ক. কিছুই শোনে না কেউ তলপেটে অনাস্বাদিত বিহ্বল কাম
[পাশের কামরার প্রেমিক]

খ. তোমার ক্লেদ সহসা ইন্দ্রধনু হল।
আর আমি কাঁকড়ার মত
অনুর্বর উল্লাসে ভোজে মত্ত, একের পর এক
শুধু ক্ষত তৈরি করলাম।
[পরস্পরের দিকে]

গ. এই ক্ষণে ছিন্ন ঘাঘরার দ্যুতি, উরুর অরুণিমা, দুরন্ত পা
চক্ষে মাধুরী জোগায়, ভরে দ্যায় অশান্ত নিষ্ঠুর জাগরণে।।
[মোহন ক্ষুধা]

ঘ. তখন মুঞ্জরিত মাংসের ঘরে
পাঁচটি প্রদীপ আনে আলোকিত উৎসবের রাত
[ইন্দ্রজাল]

ঙ. যেন সমুদ্রোচ্ছ্বাস তার বাহুতে, কটিতে
জঙ্ঘার আলোড়নে, নিতম্বের তৃষ্ণার্ত তরঙ্গে
তরোয়ালের মত কিংবা তীক্ষ্ণ ধারালো চাঁদের মত

চোখের আঁধারে ঐ স্বর্গের ডাইনী যেন গতির পুলকে
কী তীব্র জোৎস্না হেনে যায়
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়।।

[নর্তকী]

সুধীন্দ্রিয় ক্ষয়চেতনা প্রবল হয়েছে 'পতন' শীর্ষক কবিতায়। তবে প্রকাশভঙ্গিতে রয়েছে কাদরীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মোট বারো লাইনের কবিতার একেবারে শেষ পংক্তিটি যতিচিহ্নিত। অনুরূপ অপর একটি কবিতা 'চন্দ্রাহত সাঙ্গাৎ'। উল্লেখ্য, কাদরী প্রায়শ দীর্ঘ পংক্তিপ্রবাহ শেষে বিরতিচিহ্ন সংযোজন করেন, যা এক ধরনের গতিময়তার জন্ম দেয়। 'পতন' কবিতার ভাবানুষঙ্গ নির্মাণ করেছে একাধিক নাগরিক অনুষঙ্গ :

টেবিলের উজ্জ্বল রেডিয়ো একদিন জ্বলে না ডায়াল তার
নিরালোকে পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ ধুলোর আস্তরণে বহুদিন
একে একে খসে পড়ে প্রতি অঙ্গ, ঝলসে যায় ভাল্‌ভ

চিকন মসৃণ তার, প্রাণবাহী শিরা উপশিরা,
ছিন্ন হয় টেরিলিন, মহিলার ত্বকের মহিমা,
গ্যারেজে বিধ্বস্ত হয় মোটরের মাংসল টায়ার,

শহীদ কাদরীর নগর-চৈতন্য শামসুর রাহমানের ন্যায় পুরোনো শহরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-কিংবদন্তীস্নাত নয়; উচ্চবিত্ত জীবনের উপকরণ-বিজড়িত এই নাগরিকতা নব্য, আধুনিক, ঝকঝকে। এখানে মোটরের তেরচা বনেটে বৃষ্টি পড়ে, কনিয়াকের বোতল, কড়া সিগারেট, চোখামুখো জুতো, সরু বেল্ট, সিল্কের স্কার্ফ, টেরিলিনের সার্ট, নীল চিঠি, উজ্জ্বল রুমাল দৃশ্যমান হয়; এখানে বার্মাটিকের নিপুন পালিশ, সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব, বারান্দার হাতল চেয়ার, টেবিলের উজ্জ্বল রেডিও, টেলিফোনের কালো ডায়াল, লন্ড্রির হলুদ বিল বিত্তবান নাগরিক জীবনের স্বাদ বহন করে। এখানে উঠে আসে ম্যানসন, গাড়ি বারান্দা, রেস্তোরাঁ, কেবিন এবং সেই সঙ্গে শহুরে মানুষের জীবন-জটিলতা, আবেগবৃত্তি, হতাশা, ক্রন্দন, আতঙ্ক, ক্রোধ, অক্ষমতা, অনিশ্চয়তা, শূন্যতা। পৃথিবীর বড় বড় *কসমোপোলিটান* সিটিগুলোর তুলনায় ঢাকা তখন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হলেও এই শহরকেন্দ্রিক

নাগরিক জীবনানুভব তিনি সততার সঙ্গে কাব্যজাত করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, মেধা ও মনন দিয়ে তিনি উন্মোচন করতে চেয়েছেন এই শহরের মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ। তিনি দেখেছেন শাহরিক রঙিন কোনো সন্ধ্যায় যখন হঠাৎ বৃষ্টি নামে, সবাই কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, গভীর উদ্বেগে আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে-যেন মড়কের ভয়ে পালাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে আরশোলা (বৃষ্টি, বৃষ্টি)। এই আরশোলা কি কাফকার 'মেটামরফসিস' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয় না ? ধনবাদী সমাজব্যবস্থার শিকার মানুষ আজ কীটপতঙ্গ সমতুল, আত্মভুক, আত্মকেন্দ্রিক, আতঙ্কগ্রস্ত। বিরূপ প্রকৃতির সম্মুখে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াতে পারে না এই অসহায় ফাঁপা মানুষগুলো; আবার তাদেরই মত পলায়নপর বুর্জোয়া সভ্যতার ধারক-বাহক সিপাই-সান্ত্রী-মহাজন-মোসাহেবের দল। অথচ যারা বাউণ্ডুলে, লক্ষ্মীছাড়া, অর্ধ-উন্মাদ, চোর অর্থাৎ তথাকথিত সভ্য মানুষের তালিকা-বহির্ভূত নগরীর এই দুর্যোগময় প্রহরে তারা উল্লাসমুখর। 'ইন্দ্রজাল' কবিতাতেও দেখা যায় মানুষ পিচ্ছিল কৃমির সঙ্গে উপমিত। নৈশ শহরের পার্কে, ঝোপে-ঝাড়ে, স্বপ্নের সুড়ঙ্গপথে সহজ ও অবাধ সঞ্চারণ তাদের। এলিয়টের ন্যায় কাদরীর সামনে ওড়ে 'শুকনো কাগজের মত স্বগতোক্তি/খড়কুটোর মত ছোট ছোট স্বর'। 'পতন' কবিতায় পোড়ো জানালায় 'প্রাচীন আর্শির মত পারা-ওঠা' বৃদ্ধ মুখ রটিয়ে যায় কেমন এক আতঙ্ক। ভরা বর্ষায় একজন লোককে তিনি দেখতে পান টেবিলে কনিয়াকের করুণ লেবেলহীন শূন্য বোতল নিয়ে উপবিষ্ট, 'বা-হাতে শস্তা, কড়া সিগ্রেট/ লোকটা ফতুর হয়ে বসে আছে, চুপচাপ, একা' (ভরা বর্ষায় : একজন লোক) অথবা স্মরণ করা যায় অন্ধকার রাস্তার মোড়ে দণ্ডায়মান সেই গন্তব্যসন্ধানী চালচুলোহীন বেওয়াকুফ যুবাদলকে, স্বয়ং শহীদ কাদরী যাদের একজন - তাদের প্রশ্ন ছিল :

> ধেই ধেই ধেই করতে করতে বলো
> পুরোনো বিধ্বস্ত এই হাড্ডি-মাংস নিয়ে
> দাঁড়াবো কোথায় কোন নান্-সেঁকা চুলার ভিতর ?
> [ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাবো]

এই অনিকেত, নিরালম্ব, বিপন্ন মানুষগুলো বেড়ে ওঠে নি সতেজভাবে; এদের কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই। বিংশ শতাব্দীর ক্লান্ত শিল্প আর নিঃস্বপ্ন আকাশের মুখোমুখি এইসব মানুষ সমগ্র অস্তিত্বে বয়ে বেড়ায় এক পরম শূন্যতা ও পতনের ধ্বনি। নগরসভ্যতাস্পৃষ্ট অডেনের অভিন্ন উচ্চারণ :

Say this city has ten million souls,
Some are living in mansions, some are
living in holes ;
Yet there's no place for us, my dear, yet
there's no place for us.
[Ten Songs]

প্রসঙ্গত *উত্তরাধিকার* কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটি উদ্ধার করা যায় যেখানে এদেরই অগ্রজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

না, শহীদ সেতো নেই; গোধূলিতে তাকে
কখনও বাসায় কেউ কোনদিন পায় নি, পাবে না।
নিসর্গে তেমন মন নেই, তাহলে ভালোই হতো
অন্তত চোখের রোগ সযত্নে সারিয়ে তুলতো হরিৎ পত্রালি!
কিন্তু মধ্য-রাত্রির সশব্দ কড়া তার রুক্ষ হাতের নড়ায়
(যেন দুঃসংবাদ-নিতান্ত জরুরি) আমাকে অর্ধেক স্বপ্ন থেকে
দুঃস্বপ্নে জাগিয়ে দিয়ে, তারপর যেন মর্মাহতের মতন
এমন চিৎকার ক'রে "ভাই , ভাই, ভাই" ব'লে ডাকে,
মনে পড়ে সেবার দার্জিলিঙের সে কি পিছল রাস্তার কথা,
একটি অচেনা লোক ওরকম ডেকে-ডেকে-ডেকে খসে পড়ে
গিয়েছিলো হাজার-হাজার ফিট নীচে!
সভায় দরোজা খুলি- এইভাবে দেখা পাই তার- মাঝরাতে;
জানি না কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে দিনরাত কাটে
চাকুরিতে মন নেই, সর্বদাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা
মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে!
না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো- শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।
[অগ্রজের উত্তর]

শহীদ কাদরীরা বাড়ি থাকতে পারে না, এক অনির্দেশ্য যন্ত্রণা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে। দুগ্ধফেননিভ শয্যা, উষ্ণ, নরম রুটি, শীতরাতের গরম শাল, সূর্যাস্তের

রঙিন উদ্যান, খোলামেলা হাওয়া, সৎসঙ্গ, সজ্জন ফেলে তারা চোখ রাখে আঁস্তাকুড়ে, পঁচা মাংসে ঘটায় রসনার তৃপ্তি, জটলা পাকায় কাফের গুমোটে সমবয়সী বেকার হাঘরে বাউন্ডুলেদের ভীড়ে; যেন তারা ভূতগ্রস্ত, কিছুই মনঃপুত নয় বলে নগ্নগাত্রে নেচে নেচে সন্ন্যাস নেওয়ার আয়োজন। কখনও অপ্রতিরোধ্য হয় জিঘাংসাবৃত্তি :

মাঝরাতে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে, স্পন্দমান
প্রাক পুরাণিক ঋণ শোধের উৎসবে,
এসো পরস্পরের রক্তিম লোনা মাংসে
হৃৎপিণ্ডের দামামায় আজ মুছে দিয়ে প্রস্তাবনা
সভ্যতার, গোধূলির রঙে দন্তরাজিরে রাঙাই
[আমন্ত্রণঃ বন্ধুদের প্রতি]

কিন্তু কেবলই কি পলায়ন, আত্মনিমজ্জন, আত্মবিস্মৃতি, আত্মবিনাশ ? 'আত্মার ভিতরে বিরক্তির নীল মাছি' (পাশের কামরার প্রেমিক) ওড়াউড়ির সংকেত ? অথবা 'দৈবাৎ বিক্ষিপ্ত এই বিশ্বলোকে/ মুহ্যমান নগরশীর্ষে/ লুটিয়ে পড়া এক নির্বাসিত কেতন'-এর (জন্মবৃত্তান্ত) বিপর্যয়বোধ ? জন্মবোহেমিয়ান, *আউটসাইডার*, সরবিত কবিকণ্ঠে ভিন্ন সুর উচ্চকিত 'এই শীতে' কবিতায় :

অথচ এ শীতে একা, উদ্ধত আমি
আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ
প্রতিবেশী পুরুষ নারী আর বিশাল
যে রিক্তগাছ, সে ঈর্ষায় সুখী
নিয়ত উত্তাপ দিই বন্ধু পরিজনে।
আমি শুধু
একাকী সবার জরার মুখোমুখি।

একাকিত্বের বোধ যদিও তাঁকে সমীকৃত করে প্রাঙ্গণের তরুণ কুকুরটির সঙ্গে, কিন্তু তার চোখেও তিনি দেখেন 'লক্ষ সূর্যের আসা-যাওয়া'। 'জন্মবৃত্তান্ত' কবিতায় ভেতরে ভেতরে এক নিরন্তর দহন তাঁকে প্রশ্নার্ত করে-'সূর্যের জ্বলজ্বলে আরক পান করেছিল নাকি/ মাতৃজরায়ন, আমার মাংসে যার/বিচ্ছুরিত তাপ!' স্মরণ করা যায় গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বৃষ্টি, বৃষ্টি'র দৃশ্যপট :

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)
বৃষ্টি পড়ে মোটরের বনেটে টেরচা,
ভেতরে নিস্তব্ধ যাত্রী, মাথা নীচু
ত্রাস আর উৎকণ্ঠায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে,-জল,
অবিরল

জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল,

এই জল কিসের প্রতীক? লক্ষণীয়, কবিতাটির একদিকে রয়েছে সন্ত্রাস, ত্রাস, উৎকণ্ঠা জাতীয় শব্দ, অন্যদিকে উৎফুল্ল, সহর্ষ, বন্দনা জাতীয় উদ্দীপক শব্দমালা। যেন এই কবিতা চমৎকারভাবে ছুঁয়ে গেছে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ; অবিরল এই জল বিপুল গণজাগরণের বাণীবহ। আবার, মনুষ্যসৃষ্ট সভ্যতার বিপরীতে প্রকৃতির অকরুণ উল্লাসও এখানে ব্যঞ্জনময়। কবিতার পরবর্তী স্তবকে আমরা লক্ষ করি বৃষ্টির জলে ভেসে যায় সিগারেটের টিন, সিল্কের স্কার্ফ, লন্ড্রির বিল- এক কথায় সভ্যতার সব ঠুনকো উপকরণ এবং সেইসঙ্গে জাগ্রত হয় সেই ঢেকে পড়া মানুষটি- অন্ধকার শহরে, বর্ষায়, বিদ্যুতে, নগ্নপায়ে, ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী, 'হাওয়ার পালের মতো শার্টের ভেতরে ঝকঝকে, সদ্য নতুন নৌকোর মতো একমাত্র', নিঃসঙ্গ এবং বিপর্যস্ত অথচ যার রক্তমাংসে নূহের গরগরে আত্মার প্রজ্জ্বলন। সেখানেও প্রশ্ন ছিল :

কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো ?

কিন্তু এই সম্পন্ন যাত্রা সম্ভব হয় নি। *উত্তরাধিকার* কাব্যগ্রন্থে এক অদ্ভুত তিক্ততা, বিষাদ আর বৈরাগ্য অন্তর্গত করে শহীদ কাদরী প্রসর্পিত।

নাগরিক পরিভাষা তাঁর কবিতায় নিঃসন্দেহে ভিন্ন ঔজ্জ্বল্য সঞ্চার করেছে। তিনি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন শাহরিক দৃশ্যপট ও অনুষঙ্গ। নিসর্গে তাঁর মন নেই বলে জানিয়েছিলেন তাঁর অগ্রজ, কাদরীর নিজেরও ভাষ্য ছিল :

কেক্‌-পেস্‌ট্রির মতোন সাজানো থরে থরে নয়নাভিরাম
.পুষ্পগুচ্ছের কাছেও গিয়েছি ত', ম্লান রেস্তোরাঁর
বিবর্ণ কেবিনে আশ্রয়ের যে আশ্বাস এখনও
টেবিল ও চেয়ারের হিম-শূন্যতায় লেখা আছে
তেমন সাইনবোর্ড কোন জুঁই, চামেলী অথবা
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে-ঝাড়ে আমি ত' খুঁজেও পেলাম না।
[নিসর্গের নুন]

কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি তাঁর কবিতার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নৈসর্গিক উপকরণ—ফল-ফুল, বৃক্ষলতা, প্রাণীকুল, আকাশ, জল, আলো এবং অন্ধকার। সেখানে দৃশ্যমান স্রোতস্বিনী নদী, সোনালি বালির তীর, হিরন্ময় রৌদ্র, রক্তিম কুঁড়ি, বাসন্তী আকাশ , তীব্র জ্যোৎস্না, সোনালি তারা এবং পাশাপাশি কুয়াশা, মেঘ, মেঘার্দ্র আকাশ, বজ্র-বৃষ্টি-কাদা, ভাঁটফুল, আন্ধার মান্দার গুচ্ছ, গুল্মলতা, রিক্তগাছ, হাওয়ায় ওড়া হলুদ পাতা, স্বপ্ন—পাওয়া ময়লা ধোঁয়াশা বৃক্ষ। সেখানে মাঝরাতে ওঠে তন্ত্রে—মন্ত্রে ভরা চাঁদ, জানালা বেয়ে উঁকি দেয় সলাজ উদ্ভিদ; গোলাপের কম্প্র গ্রীবা অথবা যমুনার উচ্ছল ভজন পাঠকের দৃষ্টি ও শ্রুতি নন্দিত করে। উষ্ণ রাজহাঁস, নীলরঙা মাছি, সোনালি মাছ থেকে জোনাকি, ময়ূর, প্যাঁচা, কাঠবিড়ালী, খরগোশ, হরিণী, চিতা, শেয়াল, কুকুর, বানর ইত্যাদি বিচিত্র পতঙ্গ ও প্রাণীকুল সেখানে সপ্রাণ।

অস্বীকার করা যায় না যে, শাহরিক পরিপ্রেক্ষিতে এইসব নৈসর্গিক অনুষঙ্গ অনেকক্ষেত্রে শ্লেষ বা বিদ্রুপাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু উপর্যপরি এই নিসর্গ-উপকরণের নির্গম শহীদ কাদরীর নগরসভ্যতাক্লান্ত হৃদয়টির প্রকৃতি অভিমুখিতাই জ্ঞাপন করে। অথবা বিনির্মাণ চিন্তাসূত্র অনুযায়ী বলা যায়, শহরের প্রতীকী রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের তাঁর গূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুধীন্দ্রিয় তৎসম শব্দ ও ক্লাসিক দার্ঢ্য কবিতাজাত করলেও লোকজ শব্দ ও তরল বাকভঙ্গি ব্যবহারে শহীদ কাদরীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'চন্দ্রাহত সাঙাৎ' অথবা 'ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাবো' কবিতাদ্বয় প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যেক্ষেত্রে তিনি অতিক্রম করেছেন তিরিশের কবির প্রভাববলয়। উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাৎ

কী ইৎরামি জানে অই চাঁদ
অপেক্ষায় কঙ্কে জ্বলে গ্যালো, সাঁঝ-রাত
আ-তু আ-তু ডেকে-ডেকে বয়ে গ্যালো
আইলো না উঁচু ঢিবি থেকে নেমে রূপার মোরগ

অথবা

আমাদের চাল নাই, পাতিলও নাই
পিতলের বদ্না নাই
ইয়ারেরা বেরিয়েছি তবু, একদিন ঠিক জেনো
রাত্তির কাবার করে আমরাও পৌঁছামু
অলৌকিক ইমামের কাছে কোন
অদেখা সুনীল ঈদগাহে!

উপর্যুক্ত অংশে কি ধ্বনিত হয় না উত্তর আধুনিক কবিতার বার্তা? অবশ্য শহীদ কাদরী বিশ্বাসী ছিলেন গোটা বিশ্ব থেকে বীজ সংগ্রহ করে কাব্যের কল্পতরু জন্মানোর আদর্শে। *উত্তরাধিকার*সহ তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে পাঠসমৃদ্ধ কবিমানসের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি অকাতরে ঋণ গ্রহণ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পূর্বসূরির কাছে এবং অবলীলায় উৎকীর্ণ করেছেন ঋণ স্বীকারের লিপি। প্রসঙ্গত *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* গ্রন্থের কিয়দংশ :

পার্কের নিঃসঙ্গ বেঞ্চ,
রাতের টেবিল আর রজনীগন্ধার মতো কিছু শুভ্র সিগারেট ছাড়া কেউ
কোনোদিন জানবে না-ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এক
আমারও রয়েছে। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' নামক বিশাল
বাণিজ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ আমিও রেখেছি।

তাছাড়া জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথসহ
ওসামু দাজাই
আমাকে টাকা পয়সা নিয়মিতভাবে এখনও পাঠান
বলতে পারো এ ব্যবসা বিশ্বব্যাপী -
একবার শার্ল বোদলেয়ার প্রেরিত এক পিপে সুরা আমি

পেয়েছিলাম কৈশোরে পা রেখে,
রিল্কে পাঠিয়েছিলেন কিছু শিল্পিত গোলাপ
(একজন প্রেমিকের কাছে আমি বিক্রি করেছি নির্ভয়ে)
এজরা পাউন্ড দিয়েছিলেন অনেক ডলার
রাশি রাশি থলে ভরা অসংখ্য ডলার
(ডলার দিয়ে কিনেছি রাতের আকাশ)
[টাকাগুলো কবে পাবো ?]

গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বিকশিত হয় শিল্পস্বভাব। ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই চলে উত্তরণের পথ-সন্ধান। মেধাবী শহীদ কাদরীর যোগ্যতা ছিল বিশ্বঐতিহ্য থেকে গ্রহণ ও তা স্বীকরণ করার এবং এই প্রক্রিয়ায় সমকালের বাংলাদেশের কবিতায় যুগপৎ প্রসঙ্গ ও প্রকরণে মননশীলিত আধুনিকতা পরিবহনের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বকীয়তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী শব্দের কুশলী অর্থবহ প্রযুক্তি, উপমা-চিত্রকল্পের অভিনবত্ব ও বৈপরীত্যবহ বিন্যাস কবিতার দেহগঠনে নিরীক্ষাধর্মিতা প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উত্তরাধিকারেই* পরিদৃশ্যমান।

তিনি বয়সে শামসুর রাহমান (জ. ১৯২৯) অথবা আল মাহমুদ (জ, ১৯৩৬) অপেক্ষা কনিষ্ঠতর, কিন্তু বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে এই দুজনের পাশে তৃতীয় কবিকণ্ঠ হিসেবে যথাযথভাবেই শনাক্ত হয়েছে তাঁর নাম। *উত্তরাধিকার*-এর পর *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* এবং *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই* কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে অভিজ্ঞতার রূপান্তরিত বৈচিত্র্যেও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেখানে একদিকে যেমন রয়েছে একটি গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের দহন ও দীপ্তি, কবির তীব্র ও গভীর স্বদেশবোধ; অন্যদিকে তেমনি কাব্যজাত হয়েছে যুদ্ধপরবর্তী দেশকালের সংকট, তৃতীয় বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নৈরাজ্য, অস্থিরতা, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ এবং বিশ্বরাজনীতির চালচিত্র। কিন্তু পাঠকের যা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না তা হল, সকল বেদনা, গ্লানি, পরাভব, বিচ্ছিন্নতা, বিপন্নতা ও মৃত্যুর ওপারে জায়মান কবির প্রগাঢ় জীবনপ্রেম। নিঃসন্দেহে শহীদ কাদরী নির্মাণ করেছেন কবিতার এক নতুন উত্তরাধিকার।।

গ্রন্থপঞ্জি

শহীদ কাদরী
১৯৯৩ *শহীদ কাদরীর কবিতা*। ঢাকা: সাহিত্য পত্রিকা।

মাহমুদ কামাল ও কামাক্ষানাথ সেন [সম্পাদিত]
১৯৯১ *ষাটের দশকের কবিতা* শিল্পতরু প্রকাশনী। ঢাকা।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ [সম্পাদিত]
কণ্ঠস্বর ঢাকা।

Mendelson, Edward (ed.) *W. H. Auden Collected Poem*
1976 . London: Faber and Faber.